দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম 3

জাতীয় শিক্ষা কমিশন

আবদুল খালেক — প্রাক্তন আই জি পুলিশ

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ছাড়া অতীতের শিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্ট সরকার-বিরোধী সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনে তেজী-ভাব সঞ্চার করেছে। এবারকার শিক্ষা কমিশন গঠিত হবার পর পরই মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট কে তাক-বন্দী করার কৌশল হিসেবে বর্তমান সরকার এই অপ্রয়োজনীয় কমিশন গঠন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পক্ষ থেকেও কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদের অতীতকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। সে যাই হোক কমিশনকে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরের বিরাজমান নৈরাজ্য এবং ছাত্র ও শিক্ষকের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের দৃশ্যপটে রিপোর্ট তৈরী করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি ও অযোগ্যতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কমিশনের পক্ষে সমীচীন হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে না।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, দেশবাসীর কাঙ্ক্ষিত নীতি-শুদ্ধ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে বিগত বছরগুলোয় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্বেগজনক সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং কর্তাব্যক্তিদের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতা-প্রসূত কর্মকাণ্ড শিক্ষা প্রশাসনকে অকার্যকর করে তুলেছে। শিক্ষক, ছাত্র, পাঠক্রম, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে রাজনৈতিক ছলচাতুরির অবতারণা করা হয়েছে তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা-সংকোচন নীতি এবং জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্তদের ব্যাপক বেকারত্ব বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুধা-দারিদ্র-অপুষ্টি ও ব্যাধিক্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, রাজধানীর বুকে অবস্থিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অর্থনৈতিক বিভাগে প্রথমবর্ষ সম্মান ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাতশ'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ সম্মান ক্লাসে ও উক্ত বিভাগে অনুরূপ সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে। তদুপরি ঐ কলেজে অর্থনীতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ মাষ্টারস ক্লাসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। দুই বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাস ও সম্মান ক্লাসের সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসাবে অর্থ নীতি বিভাগে আরো রয়েছে কয়েক শ' শিক্ষার্থী। কিন্তু অর্থনীতি বিভাগে মোট শিক্ষক রয়েছেন মাত্র আঠারো জন। এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাদানের সনাতন ব্যবস্থা এখনো চালু রয়েছে। বাংলাদেশে অনুরূপ আরো নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বিগত কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব কলেজে শিক্ষকের অপ্রতুলতা, ল্যাব, লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস ও শিক্ষকের বাসস্থান সমস্যা মর্মান্তিক। বাংলাদেশে আরো ১৪৮টি সরকারী কলেজ রয়েছে। সর্বমোট ৩৪টি সরকারী কলেজে সম্মান কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে মাত্র গুটিকতেক বিষয়ে। বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ৩১৪। এগুলোর অধিকাংশের সমস্যা অবর্ণনীয়।

বাংলাদেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা মোট ৯৬৬০। আটটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি দন্ত চিকিৎসা কলেজ, চারটি প্রকৌশল ইনষ্টিটিউট, দু'টি কৃষিকলেজ, একটি বয়নশিল্প ও একটি চর্মশিল্প ইনষ্টিটিউটে মোট আসন সংখ্যা ২০৩৫। দারিদ্র্য ও হাজারো প্রতিবন্ধকতা উৎরিয়ে যারা সম্মান মাষ্টারস এবং পেশাভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য, যোগ্যতা ও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে তাদের এক দশমাংশও উপরি-উক্ত উচ্চশিক্ষালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। গুণীজ্ঞানী-দের মতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু মাষ্টারস ও গবেষণার ব্যবস্থা রেখে, সরকারী কলেজগুলোকে যথোপযুক্ত সাজিয়ে-গুজিয়ে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ব্যাপকহারে সম্মান ক্লাসের ব্যবস্থা করা হলে উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ভর্তি সমস্যা অনেকাংশে লাঘব করা যেতে পারে। তারপর পর্যায়ক্রমে বেসরকারী কলেজগুলোকেও সরকারীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্মান ক্লাসের উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। তবে এই সকল সরকারী কলেজের নিয়ন্ত্রণের, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশাসনিক পরিদর্শন, পাঠক্রম নির্ধারণ ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করবে কতেক এ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়। প্রয়োজনবশতঃ মাষ্টারস ডিগ্রী ও গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে আরো কয়েকটি টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে, দেড় কোটি লোকের দেশ শ্রীলংকার পনেরটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং আমাদের প্রায় অর্ধেক লোকসংখ্যার দেশ ইংল্যাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সম্ভবতঃ আশির কম হবে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তাকে জাতীয় জীবনের দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত বলা যেতে পারে। সেশন জট, বোমাবাজি, সশস্ত্র সন্ত্রাস, খুনখারাবি ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশকে বিনষ্ট করেছে। তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে রাখলে চলবে না। শিক্ষা কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতির গভীরে গিয়ে দেখতে হবে কী করে সুষ্ঠু পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হতে পারে।

আমাদের প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগণিত সমস্যার খবর দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলোর সমাধানের সুস্পষ্ট সুপারিশ কমিশনের কাছে দেশবাসী আশা করে। শিক্ষার ভিত হিসাবে প্রাইমারী শিক্ষাকেই উন্নতমানের করতে হবে, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সেজন্যে চাই সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চতর যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষকের যুক্তিসংগত মূল্যায়ন, শিক্ষা বিভাগের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। ভাষার গুরুভারে কচি-কাঁচাদেরকে নুয়ে পড়তে দেওয়া যেতে পারে না এটা স্মরণ রাখতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে সকল শিক্ষকের জাতীয়করণ নীতি যত শিগগির গ্রহণ করা হবে তত শিগগির গ্রাম-গঞ্জে অবস্থিত বেসরকারী হাইস্কুলগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, আটষট্টি হাজার গ্রামের পাট, ধান, গম, তামাক ও ইক্ষু চাষী এবং হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশুর পালক শাকসব্জি উৎপাদক ও তাদের সহচর ক্ষেত মজুর ও অন্যান্য গরীব শ্রেণীর জনগোষ্ঠি তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমেই আর্থিক উন্নতির পথ খুঁজতে শুরু করেছে। সরকারী স্কুল-কলেজে পড়ার মতো শহরে, আধা-শহরে, উপজেলা সদরে বসবাসের আর্থিক সংগতি তাদের নেই। সে জন্যে গ্রামগঞ্জের বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে সরকারী শিক্ষক নিয়োগের অকাট্য যুক্তি রয়েছে। বর্তমানে নিয়োজিত শিক্ষকদেরকে সরকারী শিক্ষকে উন্নীত করে পরবর্তী শূন্যপদে সরকারী শিক্ষক নিয়োগ করার নীতি অবিলম্বে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রসংগতঃ নারীশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামে-গঞ্জে সম্প্রসারণের কোন নীতি বাংলাদেশে নেই। প্রাইমারীর পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভে গ্রামের মেয়েরা এগিয়ে যেতে

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম 3

পারে না বিবিধ কারণে। যাতায়াতের অসুবিধা হলো সবচেয়ে বড়। মেয়েদেরকে উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রাইমারী স্কুলেই সেকেণ্ডারী 'মেয়ে সেকশন' খোলা যেতে পারে। তাতে সরকারী ব্যয়ভার খুব বেশী হবে না। যেখানে হাইস্কুলের দূরত্ব বেশী সেখানেই এই ব্যবস্থা চালু করা দরকার হবে। কেননা নিকটবর্তী হাইস্কুলে মেয়েরাও এখন ছেলেদের সংগে একত্রে লেখাপড়া করছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুচিন্তিত বিবেচনার জন্যে অতি সংক্ষেপে উপরিউক্ত কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত করেছি। এবার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান শিক্ষার ধারা প্রবাহ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন রাখার চেষ্টা করছি। মূল ধারাটিতে রয়েছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী, সুখবাদী-ভোগবাদী আর্থ-সামাজিক ধ্যান-ধারণার সংগে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের মোটামুটি সুষম ও সংমিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে প্রাইমারী স্কুল (সরকারী ৩৬,৭২২ এবং বেসরকারী ৭৭৫৭), জুনিয়র হাইস্কুল (২২৯৮), মাধ্যমিক স্কুল (সরকারী ২২৯ এবং বেসরকারী ৭৩০২), হাই মাদ্রাসা (সংখ্যা জানা নেই), উচ্চমাধ্যমিক কলেজ (সরকারী ২ এবং বেসরকারী ৩২৫), ডিগ্রী কলেজ (সরকারী ১৫৮ এবং বেসরকারী ৩১৪) এবং বিশ্ববিদ্যালয় (৬)।

উপরিউক্ত মূলধারাটির পাশাপাশি রয়েছে ইসলামিক মৌলবাদী ধ্যান-ধারণাভিত্তিক আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের আরেকটি ধারা, যা সাম্প্রতিককালের প্রশাসনিক উদ্যোগে এবং সাহায্য-সহায়তায় লক্ষণীয়ভাবে শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সংগে মৌলবাদী শিক্ষিতদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এখনো গড়ে ওঠেনি। প্রশাসনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জোরেশোরে প্রচারণা চালাচ্ছেন যে, বাংলাদেশ হবে মসজিদ সমাজের দেশ এবং মসজিদের ইমাম সাহেবরাই হবেন বাংলাদেশের সমাজের নেতা। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঐ উদ্দেশ্যে প্রায় দুই লাখ ইমামকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও মসজিদ সমাজের ভিত তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করেছেন বলে শুনা যাচ্ছে। মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় সমাবেশকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহারের অবাধ উদ্যোগ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ গ্রহণ করেছেন। সরকার বিরোধীরাও যদি মসজিদে রাজনৈতিক বাদ-প্রতিবাদের আসর প্রতিষ্ঠা করে তাহলে আমাদের মসজিদ হবে দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক মারামারি বোমাবাজি ও সহিংস কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামিক ধারায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে ১৪০৬৬ এবতেদায়ী (প্রাইমারী), ৩০৫৪ দাখিল (সেকেণ্ডারী), ৫৮১ আলীম (ইন্টারমিডিয়েট), ৬১৯ ফাজিল (ডিগ্রী) এবং ৬৬টি কামিল (মাষ্টারস্) মাদ্রাসার মাধ্যমে। তাছাড়া গ্রামে-গঞ্জে প্রায় এক লাখ মসজিদে এবতেদায়ী স্তরের লেভেলের শিক্ষাদান করা হয়। গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরাই এই সকল মসজিদে শিক্ষালাভের জন্যে যাচ্ছে। তারপর তারা প্রাইমারী স্কুলে যেতে চায় না। সেজন্যে প্রাইমারী স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সে হারে বাড়ছে না।

উপরিউক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী স্কুল কলেজের মতো সরকারী ও বেসরকারী অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা বছরে প্রায় দশ হাজার টাকার সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে। ধনিক-বণিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মাদ্রাসা শিক্ষায় টাকা-পয়সা জায়গা-জমি দান করে থাকেন। কিছুকাল আগে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করেছেন যে চলতি অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে মাদ্রাসার সরকারীকরণের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে, এবং এখন থেকে একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই নতুন করে মাধ্যমিক স্কুল খোলার অনুমতি দিবে। এই ঘোষণায় শিক্ষানীতির নতুন দিগন্ত উদঘাটিত হয়েছে। মৌলবাদী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এবতেদায়ী ও এবতেদায়ী পরবর্তী স্তরে বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বলে জানি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জনশক্তি পরিকল্পনার সংগে মৌলবাদী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করার চিন্তা-ভাবনা জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো উচ্চ-মাধ্যমিকের পরবর্তী স্তরে শুরু হতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে সেজন্যে প্রস্তুতিমূলক ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে। মূল শিক্ষা ধারার অংগ হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে দেখা হলে স্কুল-কলেজের পরিবেশেই ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, যার ফলে স্কুল-কলেজের সমান্তরাল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন হবে না এবং সেগুলোকে সাধারণ শিক্ষালয়ের ধাচে সাজিয়ে-গুজিয়ে একই পরিবেশে উচ্চমানের ধর্ম-শিক্ষাদানের ব্যবস্থাধীন রাখা যায়। ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা ভাষায় হলে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা সবাই আইনের শাসনের ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা, কিন্তু সেই শাসনটি নিজের বেলায় প্রয়োগ করতে চাই না বলে আইন ও গণতন্ত্র বাংলাদেশে দুর্যোগের কবলে পতিত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আইন শিক্ষাকে অবাঞ্ছিত অবহেলায় রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে কোন সরকারী আইন কলেজ নেই। আইন-দরদী আইনজীবীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় পঁচিশটি আইন কলেজ পরিচালিত এই সকল কলেজের জন্য আজো সরকারী দান-অনুদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দেখা যাক, এ বিষয়ে শিক্ষা কমিশন, কিছু বলেন কিনা। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের আইন শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এসেছেন বটে।

আরেকটি কথা বলেই শেষ করছি। সেটি হলো: হাজারখানেক কিণ্ডারগার্টেন, ১০টি ক্যাডেট কলেজ এবং কতেক রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এবং অধুনা প্রতিষ্ঠিত বিবিধ নামের টিউটরিয়্যাল হোমে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে তা ধনিক-বণিক, উচ্চ পদস্থ সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য বিত্তশালীদের ছেলে মেয়েদের একচেটিয়া দখলে। এই সকল ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের আচরণে ও মনোভঙ্গিতে যে বৈশিষ্ট্য বিকাশলাভ করে তা পরবর্তীতে ও কর্মজীবনে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীভঙ্গিতে পরিণত হয়। এই শ্রেণীভঙ্গির ধারক বাহকরা স্বাভাবিক কারণেই গ্রাম-গঞ্জের পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় সকলের প্রতিভা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা বৈষম্যমূলক হতে পারে না এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার নিশ্চয়তা দান করা হয় এবং বেকারত্বকে স্বীকার করা হয় না, বাংলাদেশে সেই ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার শুভ লক্ষণ ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে আর্ত, ক্ষুধার্ত অথচ প্রশান্ত মানবগোষ্ঠির চেতনাবোধে। জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে চলতি প্রজন্মের আশা আকাংক্ষার ভাবমূর্তিতে কথা বলতে হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা।